দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা এবং দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

মোঃ জহির উদ্দিন আরিফ[১]

সারকথা

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ নির্ণয় ও তার আলোকে দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল উন্নয়ন বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। প্রবন্ধটি বিভিন্ন গবেষণামূলক বই, প্রবন্ধ ও প্রকাশিত রিপোর্ট থেকে প্রাপ্ত মাধ্যমিক উপাত্ত ও তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। তাছাড়া প্রাথমিক তথ্যের উৎস হিসেবে দীর্ঘদিনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে বিষয়টি বিশ্লেষণের প্রয়াস চালানো হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে বাংলাদেশের সামগ্রিক আয় ও সম্পদ এবং মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত বিভিন্ন অধিকার ও সুযোগের অসম বন্টনের ফলে সৃষ্ট বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিকের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। প্রবন্ধে দেখানো হয়েছে যে, শুধুমাত্র জনগণের আয় ও সম্পদের স্বল্পতার কারণেই দারিদ্র্য সৃষ্টি হয় না, বরং মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রযুক্তিগত নানাবিধ অধিকার ও সুযোগ ভোগের বঞ্চনা থেকেও মানুষ দারিদ্র্যে ভোগে; এমনকি সার্বিকভাবে স্বাভাবিক জীবন ধারণে ব্যর্থ হয়, পরিবার ও সমাজে নানাভাবে যন্ত্রনার স্বীকার হয়ে চিন্তাশক্তি ও কর্মশক্তি হারায় এবং অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ফলে এরূপ বহুমাত্রিক দারিদ্রের বিমোচন কৌশলও সঙ্গত কারণেই একমাত্রিক না হয়ে বহুমাত্রিক হবে। তাই শুধুমাত্র অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ও এর সুষম বন্টনই একমাত্র পন্থা নয়, বরং বিকল্প কৌশল হিসেবে দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য সক্রিয় সামাজিক নীতি গ্রহণ, সরকারী-বেসরকারী ব্যবস্থায় ধারাবাহিকভাবে সুপরিকল্পিত টার্গেটভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী গ্রহণ ও কার্যকরীকরণ, গ্রাম ও শহরে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ভোটদানের অধিকার, তাদের স্বাধীন ও যৌক্তিক মতামত প্রকাশের অধিকার, সম্পত্তি গ্রহণ ও হস্তান্তরের অধিকার, কাজ পাওয়ার ও করার অধিকার, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ ও উন্নয়নে নারীকে 'সক্রিয় অংশীদার'করণ, সমাজের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যকে যাদুঘরে পাঠানা যেতে পারে। তাই এ জন্য বাস্তবসম্মত সরকারী-বেসরকারী উদ্যোগ ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ও সৃজনশীলতার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়া একান্ত প্রয়োজন যা বাংলাদেশকে অদূর ভবিষ্যতে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী, মননশীল ও শান্তিময় আধুনিক দেশে রূপান্তরিত করবে বলে আশা করা যায়।

ভূমিকা

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে এ দেশের জনসংখ্যা প্রায় ১৬ কোটি এবং মাথাপিছু বার্ষিক আয় প্রায় ১৫৮৫ (adjusted for purchasing power parity) মার্কিন ডলার (রমেশ ও অন্যান্য, ২০১২)। এ দেশটি উন্নয়নের কয়েকটি ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে ২০১৫ সাল নাগাদ জাতিসংঘের 'সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে সক্ষম হয়েছে। দেশটিতে মূল্যস্ফিতি বাড়লেও সম্প্রতিকালে তা ডাবল্ ডিজিটের নীচে অবস্থান করছে। তবে এখনও এ দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে।

সাধারণ অর্থে 'দারিদ্র্য' বলতে 'বঞ্চনার অনুভূতি'কে বুঝায়। কিন্তু দারিদ্রকে এক কথায় সঙ্গায়িত করা কঠিন। বস্তুতঃ দারিদ্র্য কি এবং কারাই-বা দারিদ্র্য তা একমাত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণযোগ্য নয়, বরং তা বহুমাত্রিকতার আলোকে বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

দারিদ্র্যকে পরম অর্থে সঙ্গায়িত করা যায় অথবা আপেক্ষিক অর্থে বিবেচনা করা যেতে পারে। একটি দেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে যারা ব্যর্থ তারা দরিদ্র; এটি হচ্ছে 'পরম দারিদ্র্য' (Absolute Poverty)। আবার একটি দেশের সাথে অপর একটি দেশের মানুষের আয়ের ও অন্যান্য বঞ্চনার তুলনা থেকেও দারিদ্র্য পরিমাপ করা যায়; যাকে 'আপেক্ষিক দারিদ্র্য' (Relative Poverty) বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

বয়লি (Boyle) (১৯৯০) এবং রেইন (Rein) (১৯৭০) দারিদ্র্যের বিশ্লেষনে তিনটি ধারণা ব্যবহার করেন। যথা- (১) জীবন ধারণ, (২) অসমতা ও (৩) সহিষ্ণুতা। প্রথমটি মূলতঃ সমাজে কাজ করে খাওয়ার মত শক্তি ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে যে পরিমাণ খাদ্য ও সেবা দরকার তা যারা পায় না তাদেরকেই দরিদ্র বুঝানো হয়। দ্বিতীয়টি মূলতঃ সম্পদ ও আয়ের বন্টনে বৈষম্যের ভিত্তিতে এবং তৃতীয়টি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যাদের অবস্থান নিম্নে, যারা কম খায়, ভাল কাপড় পরতে পারে না, যাদের বাহ্যিক চাকচিক্য নেই, তারাও দরিদ্র হিসেবে চিহ্নিত।

[১]মোঃ জহির উদ্দিন আরিফ, সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস স্টাডিজ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ; এবং প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ রেনেসাঁ ফাউন্ডেশন। ই-মেইলঃ <mjarif2004@yahoo.com>, <brfoundation2014@gmail.com>। 1[Md. Zahir Uddin Arif is an Associate Professor, Department of Marketing, Faculty of Business Studies, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh, and President, Bangladesh Renaissance Foundation (BRF), E-mail: <mjarif2004@yahoo.com>, <brfoundation2014@gmail.com>]

আবার এ. কে. সেন (১৯৯১)-এর মতে, দৈহিক ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য যে পরিমাণ খাদ্য নয় এমন পণ্য ও সেবার প্রয়োজন তা যারা মেটাতে পারে না, তারাই দরিদ্র। এখানে তিনি দারিদ্র্যের বর্ণনায় জৈবিক দিকটি তুলে ধরেছেন।

মিলার (Millar) এবং রবি (Roby) প্রমুখ অর্থনীতিবিদ সমাজের আয় বন্টনের দিক দিয়ে বঞ্চিত শ্রেণীকে দরিদ্র বলে চিহ্নিত করেন। সমাজের দৃষ্টিতে যে মানের জীবন যাপন কমপক্ষে করা প্রয়োজন তার চেয়ে নিম্ন মানের জীবন যারা করছেন তারা সকলেই দরিদ্র।

আনিসুর রহমান (১৯৯৭) তার "দারিদ্য গণনা, দারিদ্য বিমোচন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারসহ প্রবৃদ্ধি" নামক প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন- "আজকের অর্থনীতিবিদদের অনেকেই যারা খাদ্য উপাদান ও খাদ্য বহির্ভূত উপাদান পেতে প্রয়োজনীয় মাথাপিছু আয়ের হিসাবের উপর নির্ভর করে 'দারিদ্র্য রেখা' টানছেন এবং 'চরম দারিদ্র্য রেখা'ও টানছেন তাদের এরকম দর্শন দরিদ্র মানুষকে 'গৃহপালিত পশু'র মতই গণ্য করে।" তার এ প্রবন্ধে তিনি আতিউর রহমান ও অন্যান্য গবেষকদের গবেষণা ('সমুন্নয়' কর্তৃক পরিচালিত গবেষণা, ১৯৯৬) সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন- "সমুন্নয়ের গবেষণাটি জনগণের সাথে আলোচনাভিত্তিক এবং এতে জনগণের নিজেদের মধ্যেও আলোচনা প্রণোদিত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মতামত অনুসারে বিশুদ্ধ পানি, স্যানিটেশন, সন্তানের শিক্ষার জন্য ন্যূনতম খরচ, সুচিকিৎসার জন্য ন্যূনতম খরচ, চলাফেরার নিরাপত্তার খরচ, মেয়েদের সম্ভ্রম রেখে চলার খরচ ইত্যাদি থেকে বঞ্চনা তাদের মাঝে দারিদ্র্য চেতনা সৃষ্টি করে।"

আনিসুর রহমান (১৯৯৭) এ সকল সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের চেতনার পিছনে আরো কয়েকটি দিকের উল্লেখ করেন যাতে সাধারণ মানুষের মনের দাবীর প্রতিফলন প্রতিভাত হয়েছে। যেমন-

ক) প্রসূতি পরিচর্যা ও উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে সন্তান প্রসবের খরচ;
খ) সন্তানের বিবাহের ন্যূনতম খরচ;
গ) জীবনের গোপনীয়তা (প্রাইভেসি) বজায় রেখে বাস করার মত বাসস্থানের খরচ;
ঘ) আইন আদালতের কাছে সেবা ও ন্যায় বিচার পাবার খরচ- প্রতারণা, লুণ্ঠন. ডাকাতি, সন্ত্রাস, ধর্ষন, ফতোয়াবাজি, নারীর মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে;
ঙ) বৃদ্ধ বয়সেও মানুষের মত বাঁচবার জন্য পুঁজি;
চ) মৃতদেহ সৎকারের এবং কুলখানি ও চল্লিশা পালনের খরচ;
ছ) দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য পুঁজি (বন্যার আঘাত, বাড়ি পুড়ে যাওয়া, গরু মারা যাওয়া); ইত্যাদি।

আবার এ সকল খরচের অনেকগুলোই স্থানভিত্তিক (Location Specific) বলে তিনি তার প্রবন্ধে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাই শুধু ব্যক্তির আয় বিবেচনা করলেই হবে না, ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করছে সেখানে কোন্‌টি (যথাঃ বিশুদ্ধ পানি, শিক্ষা ও সুচিকিৎসা) পেতে কি খরচ তাও বিবেচনা করতে হবে। এভাবে মানুষের নিজস্ব দারিদ্র্য চেতনা থেকে 'দারিদ্র্য রেখা' টানলে, যা তুলনামূলক ও স্থানভিত্তিক, এবং তুলনামূলক বলে কালভিত্তিকও, সামাজিক ন্যায় বিচারের কিছুটা বিবেচনা এর মধ্যে চলে আসে বলে তিনি মনে করেন।

অমর্ত্য সেন (১৯৯৯) তার "Development As Freedom" গ্রন্থে মানুষের জন্য সার্বিক মুক্তি ও স্বাধীনতার বিষয়টি তুলে ধরেছেন। এখানে তিনি সব ধরনের মুক্তি ও স্বাধীনতার বঞ্চনাকে উন্নয়ন পরিপন্থি তথা দারিদ্র্য হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এছাড়া তিনি অর্থনীতিতে 'সত্ত্বাধিকার (Entitlement)' ধারণাটি নিয়ে আসেন। তিনি মনে করেন যে, পণ্য ও সম্পত্তির উপর মালিকানা বা সত্ত্বাধিকার ব্যতীত উপযোগ গ্রহণ সম্ভব নয়। এর ফলে সত্ত্বাধিকারের বঞ্চনাও এক ধরনের দারিদ্র্য মানুষের মাঝে সৃষ্টি করে।

বিনায়ক সেন (১৯৯৫) তার "দারিদ্র্য, অসমতা ও প্রবৃদ্ধি" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন, "বিশেষজ্ঞদের মাঝে এ (দারিদ্র্য) বিষয়ে একটা ঐকমত্য আছে যে, দারিদ্র্যের উপার্জন ও উপার্জন বহির্ভূত দু'টো দিক রয়েছে। শেষোক্তটির অন্তর্গত হচ্ছে বাসস্থান ও পরিধেয় বস্ত্রের প্রাপ্যতা, পুষ্টি, পয়ঃনিষ্কাশন, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সুযোগ, একটা পর্যাপ্ত ভোগ মাত্রার নিশ্চয়তা, সংকট মোকাবেলার ক্ষমতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তাবোধ।"

২৯ এপ্রিল, ১৯৯৮ তারিখে প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাংকের এক গবেষণা রিপোর্ট "Bangladesh: From Counting the Poor to Making the Poor Count"-এ 'দরিদ্র কারা? (Who are the Poor?)'- এ বিষয়ক একটি প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আরো কয়েকটি প্রশ্ন উল্লেখ করা হয়েছে যে, দরিদ্ররা কি মূলতঃ শহরে না গ্রামে অবস্থান করে? তারা কি নিরক্ষর? তাদের কি নিজস্ব জমি আছে? দরিদ্র পরিবার মহিলা প্রধান নাকি পুরুষ প্রধান? এভাবে বিশ্ব ব্যাংক উক্ত রিপোর্টে এ জাতীয় বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা এবং এ সকল প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মাধ্যমে দরিদ্র এবং দরিদ্র পরিবারের এ সকল বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার প্রয়াস চালিয়েছে।

সুতরাং দীর্ঘদিন ধরে উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ ও গবেষকদের মধ্যে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যের ধারণা নিয়ে যে চিন্তাভাবনা ও প্রবণতাগুলো লক্ষ করা যায় তার মধ্যে প্রধান প্রবণতা হচ্ছে- 'মাথাপিছু আয়ভিত্তিক (Head Count)' একটি হিসাব যা দারিদ্র্য গণনার একমাত্র মাপকাঠি হিসেবে গ্রহণ করা। এ প্রবণতা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী পরিস্থিতিতে তথাকথিত উন্নত বিশ্বের উন্নাসিক ও অহংকারী মানসিকতায় আচ্ছন্ন কতিপয় উন্নয়ন চিন্তাবিদের সৃষ্ট একটি অমানবিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার বহির্ভূত দর্শন দ্বারা প্রভাবিত। বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের তথাকথিত দরিদ্র দেশগুলোর অনেক উন্নয়ন অর্থনীতিবিদও যে কোন উপায়ে প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধিকে দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র উপায় বলে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু মানুষের মানবিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, পরিবেশগত ইত্যাদি সকল দিকের বঞ্চনা উপেক্ষা করে বা দেখেও না দেখার ভান করে শুধুমাত্র প্রবৃদ্ধি অর্জনই দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র পথ- এ প্রেসক্রিপশন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। ইতোপূর্বের আলোচনায় যেহেতু প্রতীয়মান যে, দারিদ্র্য একটি বহুমাত্রিক বিষয় সেহেতু দারিদ্র্য বিমোচনও বহুমাত্রিক কর্মকাণ্ড নির্ভর। দারিদ্র্যের প্রতিটি দিকের প্রতি লক্ষ রেখে তা দূরীকরণের সার্বিক কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে তা বাস্তবায়নের পথে এগিয়ে যেতে হবে। বিশেষতঃ বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে দীর্ঘকাল ধরে শুধু প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের এই একমাত্র পন্থা পুরো উন্নয়ন চিত্রকেই জটিল রূপ দান করেছে। ফলে একদিকে যেমন 'দারিদ্র্য দূরত্ব (Poverty Gap)' বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি অন্যদিকে বেড়েছে অসমতা, লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য আর উপেক্ষিত থেকে গিয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, ভৌত পরিকল্পনা, পরিবার কল্যাণ, গণতান্ত্রিক অধিকার (বিশেষ করে ভোটদানের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার), অঞ্চলভিত্তিক সুষম বন্টনের মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো। সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ রেখে বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনায় বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল উন্নয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতার সার্বিক চিত্র

বিশ্ব ব্যাংকের ইতোপূর্বে উল্লেখিত প্রকাশিত গবেষণা রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশে মাথাপিছু দারিদ্র্য তুলনামূলকভাবে পূর্বের দশকগুলোর তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে যেখানে ৪১ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেছে সেখানে ১৯৯৫-৯৬ সালে এর পরিমাণ কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬ শতাংশে। একই সময়ে মাথাপিছু দারিদ্র্যের হিসাবে দারিদ্র্য সীমার নীচের শহর ও গ্রামের মধ্যে ব্যবধানও দ্বিগুন বেড়েছে।

১৯৮৩-৮৪ সালে শহুরে ও গ্রামীণ দারিদ্র্য ছিল যথাক্রমে ২৮.০৩ শতাংশ ও ৪২.৬২ যা ১৯৯৫-৯৬ সালে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ১৪.৩২ শতাংশে ও ৩৯.৭৬ শতাংশে। আবার জাতীয় পর্যায়েও দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই রিপোর্টে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, উল্লেখিত সময়কালে বৈষম্য বৃদ্ধির হারও ছিল উর্ধ্বমুখী। শহরে আয় বৈষম্যের মাত্রার তীব্রতা গ্রামীণ আয় বৈষম্যের তুলনায় অধিক পরিলক্ষিত হয়েছে। বিশেষ করে ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ সালের মধ্যে এ বৈষম্যের মাত্রা তীব্রতর হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, অঞ্চলভিত্তিক সুষম বন্টনের অভাবে দারিদ্র্যের মাত্রা তীব্রতর হয়েছে, যা দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ের অঞ্চলভিত্তিক সুষম উন্নয়নের দাবীকে ভ্রান্ত ও অগ্রাহ্য প্রমাণিত করে দেয়।

কৃষিভিত্তিক দারিদ্র্য

বাংলাদেশের আবাদযোগ্য কৃষি জমির পরিমাণ অত্যন্ত কম। জমির সুষম বন্টনের অভাবে মাত্র শতকরা ২ ভাগ কৃষকের হাতে ২৫ শতাংশ জমি রয়েছে। শতকরা ৫৪ ভাগ জমি মাত্র ১০ শতাংশ কৃষকের হাতে রয়েছে। পক্ষান্তরে, ৫২ শতাংশ কৃষকের কোন চাষযোগ্য জমি নেই। আবার ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর প্রতি দশ জনের ছয় জনই চরম দরিদ্র। বিশেষতঃ গ্রামীণ দারিদ্র্যের ভূমিহীন ক্ষেতমজুর জনগোষ্ঠী 'হত দরিদ্র' পর্যায়ে অবস্থান করছে।

শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চনা ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশে শিক্ষার সুযোগ একটি বিশেষ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার ফলে দারিদ্র্যের প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের (১৯৯৮) রিপোর্টে দেখা যায়, যে সব পরিবার শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে সব পরিবার পূর্বের চেয়ে দরিদ্র হয়েছে। জাতীয়ভিত্তিক হিসাবে, ৬৭ শতাংশ মানুষ শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হবার কারণে উচ্চ দারিদ্র্য সীমায় অবস্থান করছে। আবার, শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেও এক্ষেত্রে ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

পেশাগত দিক দিয়ে দারিদ্র্য

বাংলাদেশে অকৃষি খাতে নিয়োজিত শ্রমিক, বর্গাচাষী, মৎস্য পেশায় নিয়োজিত শ্রমিক, পারিবারিক কৃষি শ্রমিক, সেবা খাতে নিয়োজিত শ্রমজীবি গোষ্ঠীর (যেমন– শিক্ষক, চিকিৎসক, গবেষক, আইনজীবি) তুলনায় দিনমজুর, কারখানা শ্রমিক, ক্ষেতমজুর ইত্যাদি গোষ্ঠীর মানুষ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে অবস্থান করছে।

সেবা প্রাপ্তি ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশে বিদ্যুৎ, পানীয় জল, পরিবহন ব্যবস্থা, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে সেবা প্রাপ্তির পরিমাণগত যোগানের ক্ষেত্রে বৈষম্য তীব্র। বিদ্যুতের ক্ষেত্রে গিনি সহগ (Gini Coefficient)-এর মান ০.২১৪ (সেন, ১৯৯৬) এবং পরিবহন খাতে এই গিনি সহগ (Gini Coefficient)-এর মান ০.০৭৩। ১৯৭০-৭৫ সালে নিরাপদ পানীয় জলের যোগান পেত প্রায় ৫৬ শতাংশ মানুষ। বর্তমানে সেই পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও মাথাপিছু নিরাপদ পানীয় জলের সরবরাহের পরিমাণে ঘাটতি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

লিঙ্গ বৈষম্য ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও তারা অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে বঞ্চনার শিকার। নারীর সম অধিকার চরমভাবে উপেক্ষিত থাকায় তারা উন্নয়নে পুরোপুরি 'সক্রিয় অংশীদার' হতে পারছে না। পুরুষের তুলনায় নারীর মাথাপিছু শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার কম। নারী শিক্ষার হার সার্বিকভাবে ৩১.৪ শতাংশ, যেখানে পুরুষ শিক্ষার হার ৫১.৩২ শতাংশ। আবার স্বাস্থ্য খাতের চিত্র খুবই ভয়াবহ। বাংলাদেশে প্রসূতিজনিত মৃত্যুহার প্রতি দশ হাজারে ৮৮৭ (১৯৯৬ সাল অনুযায়ী) যা বিশ্বের অন্যতম সর্বাধিক। শিশু মৃত্যুর ক্ষেত্রে কন্যা শিশু এবং পুত্র শিশুর মৃত্যুহারের অনুপাত ১.৩৩ (১৯৯৩ সাল অনুযায়ী)। ধর্মীয় ও পারিবারিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে কার্যকরভাবে নারীর ক্ষমতায়ন না থাকায় বিশেষ করে গ্রামীণ নারী জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ ব্যবধান দারিদ্র্যের মাত্রাকে তীব্র করে তোলে।

তথ্য প্রযুক্তি ও দারিদ্র্য

বিশ্বায়নের প্রক্রিয়ায় এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির অবাধ প্রবাহে বিশ্ব অর্থনীতিতে উন্নয়নের যে সুবাতাস বয়ে চলেছে তারই বাস্তবতায় তথ্য প্রযুক্তি একটি বড় ধরনের ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই নতুন তথ্য প্রযুক্তিগত বিপ্লব তথা কম্পিউটার নেটওর্য়াকিং ও ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্য আদান-প্রদান ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে এককভাবে কোন দেশ আধিপত্য ও কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারে না। তথাপি বাংলাদেশ এক্ষেত্রে তেমন জোরালো ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে যেখানে প্রায় ২০০ কোটি মানুষ ইন্টারনেট সুবিধা গ্রহণ করছে সেখানে বাংলাদেশে ব্যবহারকারীর সংখ্যা তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। উন্নত বিশ্বে যেখানে প্রতি তিন জনে একজন ইন্টারনেট ব্যবহার করে, সেখানে বাংলাদেশে এখনো মাত্র কয়েক লক্ষ লোক ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। তবে সম্প্রতিকালে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন মন্ত্রনালয়, দফতর ও প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার, ইন্টারনেট প্রযুক্তির ব্যবহার পরিলক্ষিত হলেও ওয়েবসাইটগুলোর তথ্য প্রায়শঃ আপডেট করা হয় না। এমনকি এদেশের শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনেকেই ইন্টারনেট প্রযুক্তিকে অযথা সন্দেহের চোখে দেখে যা ব্যাপক জ্ঞান চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। ফলে অনলাইনে/ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ও আর্কাইভে সংরক্ষিত রেফার্ড ও ইনডেক্সড্ ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রনিক জার্নালগুলোতে (ই-জার্নাল বা ডিজিটাল জার্নাল) বাংলাদেশের গবেষকদের প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধ খুবই অপ্রতুল। আর প্রকাশিত হলেও পর্যাপ্ত ধারণা না থাকায় এবং অযাচিত সন্দেহ, ভয় ও অনীহার কারণে প্রকাশিত ভাল মানের প্রবন্ধগুলো বাংলাদেশে যথাযথ স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে অপরাগতা প্রকাশ করায় বাংলাদেশের গবেষকরা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে পিছিয়ে পড়ছে। এ সকল জার্নালে প্রকাশনার জন্য জমাকৃত গবেষণা প্রবন্ধ পীয়ার রিভিউ করার সময় বিশেষ ধরনের সফ্টওয়ার ব্যবহৃত হয় যা 'প্লাগিয়ারিজম' রোধে সহায়তা করে যা গবেষণা জগতে সবিশেষ গুরুত্ব বহন করে। যেখানে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর বেশীর ভাগ প্রকাশক তাদের প্রিন্টেড কপির জার্নাল অবলুপ্ত করে ই-জার্নাল বা নিজস্ব ওয়েবসাইটে রেফার্ড জার্নাল প্রকাশ করছে যার ফলে প্রকাশনাগুলো অন্যান্য গবেষক ও পন্ডিত ব্যক্তিদের কাছে বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহজলভ্য সেখানে বাংলাদেশের মেধাবী গবেষকরা দেশে প্রচলিত হাতে গোনা কয়েকটি ভাল মানের প্রিন্টেড জার্নালে তাদের গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য মাসের পর মাস এমনকি কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হচ্ছে যা তাদের ধারাবাহিক গবেষণা করতে অনুৎসাহিত করছে, গবেষণার সংখ্যা ও প্রকাশিত গবেষণাপত্রের সংখ্যা অপ্রতুল থাকছে এবং মূল্যবান সময় ও মেধার অপচয় ঘটাচ্ছে। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞান-কলা-ব্যবসায়-বাণিজ্যে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশ এই প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নের যুগে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার ক্ষেত্রে অনেকখানি পিছিয়ে পড়ছে। তাই বাংলাদেশে প্রকাশিত প্রিন্টেড জার্নালগুলো প্রকাশকের নিজস্ব ওয়েবসাইটের আর্কাইভে আপলোড করে সংরক্ষন করা ও ডিজিটাল বা ই-জার্নালে রূপান্তরিত করা এখন সময়ের দাবী, বিশ্বায়নের যুগে এ থেকে বাংলাদেশের কোনমতেই আর পিছপা হওয়ার সুযোগ নেই।

ঋণের অধিকার ও দারিদ্র্য

বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্ষুদ্র ঋণ সরবরাহের প্রধান উৎস মূলতঃ ব্যাংক ব্যবস্থা এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনজিও)। সামগ্রিক ঋণ চাহিদার মাত্র ৩০-৩৫ শতাংশ ব্যাংক সরবরাহ করে যা দরিদ্র শ্রেণীর নাগালের বাইরে। বাকী প্রাতিষ্ঠানিক ঋণের বড় অংশের যোগানদাতা এনজিওসমূহ (গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, আশা, প্রশিকা, স্বনির্ভর বাংলাদেশ এবং আরও কিছু প্রতিষ্ঠান)। মূলতঃ টার্গেট গ্রুপের কাছে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম সীমিত রাখার ফলে জনগণের একটি বড় অংশ এ সুবিধার বাইরে থেকে যাচ্ছে। ফলে দারিদ্র্য পরিস্থিতির সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে না।

বাংলাদেশের জন্য দারিদ্র্য বিমোচন কৌশল

দারিদ্র্যের দুর্বিষহ যন্ত্রণা মানবাধিকারের পরিপন্থি। মানুষ তার স্বাভাবিক অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রয়োজনেই দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক করাল থাবা থেকে প্রতিনিয়ত আত্মরক্ষা করতে চায়। তাই "দরিদ্র জনগণকে, দেশের সাক্ষাৎ উৎপাদক শ্রেণীকে দেশের প্রধান গ্রোথ এজেন্ট করবার জন্য কৌশল উদ্ভাবনে, এবং এ সম্বন্ধে সমাজ সচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখতে সমাজকল্যণকামী অর্থনীতিবিদদের এগিয়ে আসার এখনই সময়।" (রহমান, ১৯৯৭: ৩৭)। বাংলাদেশের দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতার দিকগুলো বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দু'ধরনের পদ্ধতির কথা বলা যায়। যথা–

(১) পুনর্বন্টন পদ্ধতি (Redistributive Approach) ও

(২) অ-পুনর্বন্টন পদ্ধতি (Non-Redistributive Approach)।

এক্ষেত্রে প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ পুনর্বন্টন পদ্ধতি অনুসারে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে সামাজিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে। কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থায় ব্যাপক ভূমি সংস্কার করে জমির পুণঃ ও সুষম বন্টনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দারিদ্র্য বিমোচনের প্রচেষ্টা গ্রহণ হবে অনেকাংশেই বিশৃঙ্খলার নামান্তর। তাই দ্বিতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ অ-পুনর্বন্টন পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিদ্যমান সামাজিক কাঠামোর মধ্যে থেকে অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য দারিদ্র্য বিমোচনকারী বিভিন্ন কর্মসূচী হাতে নিয়ে তা দক্ষতার সাথে বাস্তবায়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা যেতে পারে।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান-এর আহ্বানে গঠিত টাস্ক ফোর্সের "দারিদ্র্য বিমোচন" সম্পর্কিত প্রতিবেদনে তিনটি পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছিল। (টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন, ১৯৯১: ২৭)। যথা–

ক) সামাজিক খাতসমূহে বাড়তি বিনিয়োগের মাধ্যমে মানুষের দক্ষতা বাড়িয়ে জীবনের মান উন্নত করে দারিদ্র্য বিমোচন করা যায়,

খ) অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বাড়িয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয়ও বাড়ানো যায় এবং

গ) নির্দিষ্ট দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় ও কাজ বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরাপত্তা বেষ্টনির ব্যবস্থা করা।

রহমান (১৯৯৬) তার "গরীব–এর বাজেট ভাবনা ও দারিদ্র্য বিমোচন" শীর্ষক গ্রন্থে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, ভৌত পরিকল্পনা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার কল্যাণ, সমাজ কল্যাণ- এই সাতটি খাতে সম্পদ প্রবাহের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

সুতরাং সমাজের বিদ্যমান কাঠামোর মধ্যে থেকে বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিম্নোক্ত কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে।

১. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য দ্রুত হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন প্রয়োজন। বিশ্ব ব্যাংকের গবেষকগণ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পরিশোধিত পরিসংখ্যানমালা বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, যে সব দেশে মাথাপিছু জাতীয় আয় দশ বা ততোধিক বছর ধরে বৃদ্ধি পেয়েছে সে সব দেশে দারিদ্র্যের হারও কমেছে একই সময়ে। (ক্রুনো, র‍্যাভালিয়ন ও স্কয়ার, ১৯৯৫; ডেনিঙ্গার ও স্কয়ার, ১৯৯৬)। এ জন্য দরিদ্র মানুষের আয় বাড়াতে হবে, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারলে এ আয় বাড়বে। সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিশেষ ধরনের প্রবৃদ্ধি অর্থাৎ 'দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি (Pro-poor Growth/Broad Based Growth)' অর্জন প্রয়োজন। গরীবদের মোট জাতীয় আয়ের যে শেয়ার তা যদি সময় অনুপাতে বাড়ে তবে বুঝা যাবে যে, 'দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি' হচ্ছে। অর্থাৎ জাতীয় আয়ে দরিদ্রদের আয়ের অংশীদারিত্ব বা শেয়ার বাড়লে দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি হবে। এখন প্রশ্ন হলো এই দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি কিভাবে অর্জন করা যাবে? বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগ লোক গ্রামে বাস করে, যাদের বেশীর ভাগই দরিদ্র। তাই এসব দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কৃষি এবং কৃষিখাত বহির্ভূত (যেমন- রিক্সা চালানো, ব্যবসা করা, দিনমজুর, কারখানায় শ্রম দান ইত্যাদি) কর্মসংস্থান তথা কৃষি এবং অ-কৃষি খাতের কার্যক্রমসমূহ বাড়ানো প্রয়োজন। আবার কৃষিখাতে সার, বীজ, কীটনাশক ঔষধ এবং সেচ ব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে উৎপাদন বাড়াতে হবে। সুতরাং 'দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি' অর্জন করতে হলে প্রয়োজন-

ক. কৃষি বা গ্রামীণ অবকাঠামোর উন্নয়ন,

খ. কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিতকরণ,

গ. কৃষিখাতের সাথে অকৃষি খাতের সংযোগ সাধন,

ঘ. কৃষিভিত্তিক বৃহৎ, মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তোলা,

ঙ. বিশেষভাবে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের উন্নয়ন,

চ. শ্রমঘন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা এবং ন্যায্য হারে মজুরী প্রদান,

ছ. শিল্পে সঠিক প্রযুক্তির ব্যবহার,

জ. বহির্মুখী শিল্পায়ন নীতি গ্রহণ ও রপ্তানী ব্যবস্থার উন্নয়ন,

ঝ. বাজারের বৃদ্ধি এবং বহিঃবাজারের সাথে আভ্যন্তরীণ বাজারের সংযোগ স্থাপন,

ঞ. দরিদ্রদের জন্য প্রয়োজনীয় ঋণের ব্যবস্থা করা,
ট. সরকারী পর্যায়ে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যবস্থা এবং এতে দরিদ্রদের ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা,
ঠ. গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে সচল ও কার্যকর করা,
ড. স্বাস্থ্য সেবা প্রদান ব্যবস্থার উন্নয়ন করা এবং প্রতিটি গ্রামে 'কমিউনিটি হাসপাতাল' প্রতিষ্ঠা করা যাতে সকলের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত হয়,
ণ. আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে দরিদ্রদের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ইত্যাদি ।

বস্তুতঃ কর্মসংস্থানমুখী শ্রমঘন প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দরিদ্রমুখী প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয় । আর এতে গরীবদের আয় বাড়ে, ফলে তাদের সংকট মোকাবেলার বা সহ্য করার ক্ষমতা (Crisis Coping Capacity) বাড়ে; শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, ভাল মানের ও রুচিশীল খাদ্য ও বস্ত্র পরিধানের সুযোগ বাড়ে । ফলশ্রুতিতে এসব কিছুই দরিদ্রদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে, ফলে উৎপাদনশীলতা বাড়ে যা পুনরায় দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য সহায়ক ।

২. সক্রিয় সামাজিক নীতি গ্রহণ

বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যাপকভাবে সরকারী পর্যায়ে ও ব্যক্তি পর্যায়ে বিভিন্ন সামাজিক নীতি গ্রহণ ও এর বাস্তবায়ন প্রয়োজন । এ জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থ বাজেটে বরাদ্ধ করতে হবে । সরকারকে এমন সামাজিক নীতি গ্রহণ করতে হবে যাতে গরীবরা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা ইত্যাদি মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে পারে । "বাংলাদেশের সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে প্রয়োজনীয় ভূমি সংস্কার সম্পন্ন করা বেশ কঠিন হবে । তাছাড়া উদ্বৃত্ত জমির স্বল্পতার জন্য ভূমি সংস্কারের বন্টনমূলক উপযোগিতাও অনিশ্চিত । তাই সামাজিক উন্নয়নমূলক খাতে, বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে অধিকতর বিনিয়োগ করা অতি জরুরী ।" (সেন, ১৯৯৫) । বিশেষতঃ শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে এবং সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করলে দরিদ্ররা উপকৃত হবে । এক্ষেত্রে শহর ও গ্রামাঞ্চলের মধ্যেকার ব্যবধান হ্রাস করতে হবে । পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে উন্নয়নে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল শিক্ষা । তাছাড়া নারী শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে । প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার রোধ করতে হবে । আশার কথা হলো, বাংলাদেশে ২০১০ সালে প্রণীত বর্তমান জাতীয় শিক্ষা নীতিতে এ সকল দিকের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে ।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণ বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক (বন্যা, ঝড়, জলোচ্ছাস ইত্যাদি) এবং মনুষ্য সৃষ্ট (চুরি, ডাকাতি, দূর্নীতি, আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ইত্যাদি) বিভিন্ন ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা তথা সংকটের সম্মুখীন হয় । এ সকল দরিদ্রদের সংকট মোকাবেলার বা সহ্য করার ক্ষমতা অনেক কম । ফলে তারা তাদের সীমিত সামর্থ্য বা অর্থনৈতিক ক্ষমতা দিয়ে সংকট কাটিয়ে উঠতে পারে না । আবার অনেক সময় সংকট পূরণের প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে সে প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় । সুতরাং এমন সামাজিক নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন যাতে বাংলাদেশের এ সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংকট মোকাবেলার ক্ষমতা বাড়ে ।

৩. চিহ্নিত কর্মসূচী গ্রহণ

সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র শ্রেণীকে রক্ষা করার সুপরিকল্পিত টার্গেটভিত্তিক অর্থনৈতিক কর্মসূচী নেয়া হলে সমাজে বিদ্যমান অসমতা কমিয়ে আনা সম্ভব হবে । কারণ দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন চিহ্নিত কর্মসূচী গ্রহণ করলে সামাজিক নিরাপত্তার জাল (Social Safety Nets) বিস্তৃত হবে । বিশ্ব ব্যাংক (১৯৯৮) তার প্রতিবেদনে জরুরী ভিত্তিতে 'নিরাপত্তা জাল' কর্মসূচী বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছিল । কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী, ভালনারেবল গ্রুপ ডেভেলপমেন্ট (ভিজিডি), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (ভিজিএফ), টেস্ট রিলিফ (টিআর) ইত্যাদি চিহ্নিত কর্মসূচী বাংলাদেশে ইতোমধ্যে গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা দরিদ্র শ্রেণীর জন্য কল্যাণকরও হয়েছে । সরকারের এই সকল কল্যাণকামী কর্মসূচী দুঃস্থদের কিছুটা পরিমাণে হলেও সহায়তা দেয়, অর্থাৎ এর ভূমিকা সাময়িক । কিন্তু এতে দারিদ্র্য বিমোচন টেকসই হয় না, দারিদ্র্য স্বমূলে উৎপাটনও হয় না । কারণ প্রশাসনিক জটিলতা, দূর্নীতি, সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থার অভাব ইত্যাদি কারণে এ কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়নে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে । তাই এ সকল সমস্যা ও জটিলতা নিরসনের পদক্ষেপ সরকারী পর্যায়ে ও স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণ করা হলে এ সকল চিহ্নিত কর্মসূচীর কার্যকারিতা দারিদ্র্য বিমোচনে অনেকখানি সহায়ক হবে- এ কথা বলা যায় ।

৪. বিভিন্ন অধিকার গ্রহণের সুযোগ দান

দরিদ্রদের বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে । যেমন– ভোটদানের অধিকার, স্বাধীন ও যৌক্তিক মতামত প্রকাশের অধিকার, সম্পত্তি গ্রহণ ও হস্তান্তরের অধিকার, কাজ পাওয়ার ও করার অধিকার, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি । গ্রাম ও শহরে মহিলা-পুরুষ নির্বিশেষে সকল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর এ সকল অধিকার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে । দারিদ্র্য বিমোচনের স্বার্থেই নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে । নারী আজ আর উন্নয়নের 'নিষ্ক্রিয় অংশীদার' নয় বরং 'সক্রিয় অংশীদার' (সেন, ১৯৯৯) ।

গ্রামগুলোতে পর্যাপ্ত শহুরে সুবিধা যেমন- বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুতের ব্যবস্থা, জ্বালানীর ব্যবস্থা, বাসস্থান সুবিধা, যাতায়াত ও যোগাযোগের ব্যবস্থা ইত্যাদি নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে এনজিও প্রদত্ত সুবিধা ও বৈদেশিক সাহায্য দূর্নীতিমুক্তভাবে, সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে। এছাড়া যুব সমাজকে শিক্ষিত ও দক্ষ করে তুলতে হবে এবং তাদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও উন্নয়ন সাধন করতে হবে যাতে তারা সরকারী চাকুরীর আশায় না থেকে বেশী বেশী করে উৎপাদনশীল খাতে নিজেদেরকে নিয়োগ করতে সচেষ্ট হয়। এর ফলে দারিদ্র্য বিমোচন ত্বরান্বিত হবে। তাছাড়া দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে তথ্য প্রযুক্তি তথা ইন্টারনেট প্রযুক্তি কার্যকরভাবে ব্যবহারের শক্তি অর্জনে বাংলাদেশকে আরো সক্রিয় হতে হবে এবং দক্ষ প্রোগ্রামার তৈরীর মাধ্যমে উন্নয়নের পথে অনেক দূর এগিয়ে যেতে হবে।

৫. সুশাসন এবং সামাজিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ

সমাজের সর্বস্তরে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে দরিদ্র মানুষ আশার আলো দেখবে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে তাদের সক্রিয় ও স্বতঃস্ফুর্ত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। ফলে সমাজের সদস্য হিসেবে তারা নিজেরাই নিজেদের সমস্যা মিটাতে সক্ষম হবে যা তাদের আত্মনির্ভরতা অর্জনে সহায়ক হবে। "আজ আমাদের দেশটা যে এমন বিষম গরিব তার প্রধান কারণ, আমরা ছাড়া ছাড়া হইয়া নিজের দায় একলা বহিতেছি। ভারে যখন ভাঙ্গিয়া পড়ি তখন মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার জো থাকে না।...অনেক গরিব আপন সামর্থ্য এক জায়গায় মিলাইতে পারিলে সেই মিলনই মূলধন।...অনেকের ভাবনার যোগ ঘটিয়া সভ্য মানুষের ভাবনা বড় হইয়াছে। তেমনি অনেকের কাজের যোগ ঘটিলে জটিল কাজ আপনি বড়ো হইয়া উঠিতে পারে।" (ঠাকুর, ১৩৯৮ বাংলা: ৩১৪)। সুতরাং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য একদিকে যেমন সুশাসন সমাজে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন তেমনি অন্যদিকে সমাজের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সামাজিক প্রক্রিয়ায় ব্যাপক হারে অংশগ্রহণ একান্ত আবশ্যক।

উপসংহার

বাংলাদেশের দারিদ্র্যের বহুমাত্রিকতা বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য 'বহুমাত্রিক কৌশল' নির্বাচন, প্রয়োগ ও এর বাস্তবায়ন অপরিহার্য। সে আলোকে উল্লেখিত কৌশলগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের 'বহুমাত্রিক পন্থা' হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। পাশাপাশি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কোন্ বিষয়গুলোতে জরুরী দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন সে বিষয়েও এ প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে। তাই কোন্ নীতিমালা গ্রহণ করলে প্রবৃদ্ধির হার বজায় রেখে দারিদ্র্যের উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করা যাবে সে ব্যাপারে সচেতন হতে হবে– শুধু প্রবৃদ্ধির হার ত্বরান্বিত করলেই চলবে না। সামাজিক ন্যায় বিচারসহ প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সামষ্টিক কৌশল গ্রহণ অনেকাংশেই যে বিবেচনাপ্রসূত- এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

দারিদ্র্য বিমোচনে শুধুমাত্র সরকারী উদ্যোগই নয়, বেসরকারী ও জনগণের সম্মিলিত উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তাও অপরিসীম। সুতরাং বিকল্প ভাবনা দিয়ে দারিদ্র্যকে জয় করতে হবে। মানুষ তার সৃজনশীলতার মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হতে পারে। তাই বলা যায়, আত্মশক্তিতে বলীয়ান ব্যক্তি কখনো দরিদ্র থাকতে পারে না। দারিদ্র্য মানবিকতার বিরুদ্ধে একটি শ্লোগান। অমানবিকতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাম্য, ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন তাই আজ আধুনিক উন্নয়ন অর্থনীতিবিদ, চিন্তাবিদ ও গবেষকদের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তথ্যসূত্র

[১] Bruno, M. Ravallion, M. and Squire, L. (1995), "Equity and Growth in Developing Countries: Old and New Perspectives on the Policy Issues" (Mimeo.), World Bank: Washington, D.C.

[২] Deininger, K. and Squire, L. (1996), "New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth" (Mimeo), World Bank: Washington, D.C.

[৩] Ramesh, Jairam, Pande, Varad and Bhandari, Pranjul (2012), "Heard of the 'Bangladesh Shining' Story?", The Hindu, September, 7. http://www.thehindu.com/opinion/op-ed/article3867058.ece

[৪] রহমান, মো: আনিসুর (১৯৯৭), "দারিদ্র্য গণনা, দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক ন্যায় বিচারসহ প্রবৃদ্ধি", রুশিদান ইসলাম রহমান (সম্পাদিত), *দারিদ্র্য ও উন্নয়ন: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ*, বিআইডিএস, ঢাকা।

[৫] রহমান, মোঃ আনিসুর (১৯৯৮), "সামাজিক ন্যায় বিচারসহ প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য বিমোচন", *মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাংলাদেশঃ অর্থনীতি ও গণতন্ত্রের সংকট*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, জানুয়ারি, পৃঃ ১২৪-১২৯ ।

[৬] রহমান, আতিউর (১৯৯৬), "গরীব–এর বাজেট ভাবনা ও দারিদ্র্য বিমোচন", *ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট পলিসি এনালাইসিস অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি*, প্রশিকা, ঢাকা, জুলাই, পৃঃ ১-১১২ ।

[৭] Sen, Amartya (1999), "Women's Agency and Social Change", *Development as Freedom*, Oxford University Press, New Delhi, pp. 189-203.

[৮] Sen, Binayak (1996), "Economic Development and Human Growth in Bangladesh: 1973-1995", *Journal of Social Studies*, No. 74 (Special Issue: 25 Years of Bangladesh), Centre for Social Studies, Dhaka, pp. 62-99.

[৯] সেন, বিনায়ক (১৯৯৫), "দারিদ্র্য, অসমতা ও প্রবৃদ্ধি", *অর্থনৈতিক সংস্কারের অভিজ্ঞতাঃ বাংলাদেশের উন্নয়ন পর্যালোচনা ১৯৯৫*, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি), ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড ।

[১০] টাস্ক ফোর্স প্রতিবেদন (১৯৯১), প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২৭ ।

[১১] The World Bank Report (1998), "Bangladesh: From Counting the Poor to Making the Poor Count, Poverty Reduction and Economic Management Network", World Bank: South Asian Region.

[১২] ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩৯৮ বাংলা), "সমবায় নীতি", *রবীন্দ্র রচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড, বিশ্ব ভারতী ।